রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প : আমাদের উদ্বেগসমূহ

[সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনকে 'জাতীয় গৌরবের বিষয়' হিসেবে প্রচার করে দেশকে এক ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। এর বিরোধী কোনো আলোচনা বা প্রশ্ন যাতে উত্থাপিত না হয় তার জন্য এলাকায় ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ রাজধানীর মুক্তিভবনের প্রগতি সম্মেলন কক্ষে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প : সমাধান না বিপদ' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। এতে কমিটির পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ***আবুল হাসান রুবেল****। এখানে তা প্রকাশ করা হল।]*

কয়েকদিন আগেই রূপপুর প্রকল্পের উদ্বোধন হয়ে গেল এবং যথেষ্ট ঢাকঢোল পিটিয়ে বাংলাদেশের পারমাণবিক যুগে প্রবেশের উদযাপন করা হলো। এরকম একটা জনবহুল জায়গায় পারমাণবিক প্রকল্পের মতো একটা ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প কেন? সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের ভেতর থেকে আসা নানা উদ্বেগ নিরসনে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে বরং সবকিছুতেই কিছু গৎবাঁধা উত্তর দেয়া হচ্ছে। এমনকি প্রকল্প এলাকায় এ বিষয়ে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ, সমালোচনার পথকেও বন্ধ করে রাখা হয়েছে, যা আসলে এই প্রকল্প নিয়ে আমাদের আশঙ্কাকেই আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই প্রকল্প বিষয়ে আমাদের উদ্বেগের মূল বিষয়গুলো এখানে সংক্ষেপে উত্থাপনের চেষ্টা করছি:

১. প্রথমেই আসা যাক প্রকল্পের স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে। এই স্থানটি নির্বাচন করা হয়েছিল ১৯৬১ সালে। তখন সেখানকার জনবসতি আজকের মতো ছিল না। আর জনবসতি থাকলেও পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের জনগণের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, প্রকৃতি বিষয়ে তেমন উদ্বেগ থাকার কথা নয়। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। লোকসংখ্যা বেড়েছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এ দেশের মানুষের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, দেশের প্রকৃতি নিশ্চয় আমাদের সবচেয়ে বড় বিবেচনার বিষয় হওয়া দরকার। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৩০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ ধরে নিরাপত্তা অঞ্চল ধরলে তার ভেতরে পাবনা জেলার বেশিরভাগ অঞ্চল, কুষ্টিয়া জেলার একাংশ, নাটোর জেলার একাংশ এর ভেতরে পড়ে, যার জনসংখ্যা ৪০ লাখের বেশি। ৫ কিলোমিটারের মধ্যেই পড়ে ঈশ্বরদী শহর। এমনকি রূপপুরের একেবারে লাগোয়া লালন শাহ সেতু, ইপিজেড, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, পদ্মা নদী, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিধন্য বিবিসি বাজার। পুরোটা এখন একটা প্রাণবন্ত এলাকা। দেশের লিচু উৎপাদনের, সবজি উৎপাদনের একটা বড় অংশ আসে এই অঞ্চল থেকে। এরকম একটা জনবহুল, প্রাণচঞ্চল অঞ্চলে পারমাণবিক প্রকল্পের মতো একটা ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প কেন?

২. আমাদের উদ্বেগের আরেকটি বড় দিক হলো পারমাণবিক প্রকল্প পরিচালনায় আমাদের নিজস্ব দক্ষ জনবলের অভাব। সরকার এ বিষয়ে বলছে, তারা বিভিন্নজনকে ভারত, রাশিয়ায় প্রশিক্ষণে পাঠিয়ে পর্যাপ্ত জনবল সৃষ্টি করছে। কিন্তু জনবল মানে রি-অ্যাক্টর অপারেটর নয়। প্রশিক্ষণে পাঠানোর মধ্য দিয়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জনবল তৈরি হচ্ছে না। আইএইএর গাইডলাইন অনুসারে, আমরা যে সময় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করতে চাই তার অন্তত ১০ বছর আগে আমাদের জনবল তৈরি করতে হবে। এই জনবল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র-সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তগুলো নেবে। এই সিদ্ধান্ত ভুল হলে তা আর শোধরানোর সুযোগ নেই। আইএইএর গাইড অনুসারে, যাঁরা এ সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁদের মধ্যে এমন কয়েকজন থাকতে হবে, পরমাণু প্রযুক্তি সম্পর্কে যাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা চুল্লি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের সমপর্যায়ের। সমীক্ষার কাজ করছে রাশিয়ানরা। তাদের কাজগুলো তত্ত্বাবধায়নও করছে রাশিয়ানরা। 'ফ্রম বিগিনিং টু এন্ড'–সবকিছু করছে রাশিয়ানরা। অর্থাৎ সবকিছুই ছেড়ে রাখা হয়েছে তাদের ওপর। আমাদের নিজস্ব দক্ষ জনবল না থাকলে ভবিষ্যতে যে কোনো কিছুর জন্য তাদের ওপরই নির্ভর করতে হবে। এক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো পক্ষকে নিয়োগ করে তাদের মনিটরিংয়ের কোনো ব্যবস্থাও করা হয়নি।

৩. তৃতীয় উদ্বেগের বিষয় হলো পানি। যখন এই প্রকল্প প্রথম নেয়া হয়েছিল তখনও ফারাক্কা বাঁধ হয়নি। পদ্মা ছিল এক প্রমত্তা নদী। এখন শুকনো মৌসুমে পদ্মায় পানির পরিমাণ অস্বাভাবিক পরিমাণ কম থাকে। পদ্মায় নৌকার বদলে গরুর গাড়ি চলার অবস্থা সৃষ্টি হয়। জেআরসির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছর শুষ্ক মৌসুমে প্রতি ১০ দিনওয়ারি হিসাবে ১ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি ২৯ হাজার ৭৩৩ কিউসেক, ১১ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২৮ হাজার ৮২০ কিউসেক, ২১ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পেয়েছে ২৬ হাজার ৮৬৫ কিউসেক পানি। মার্চের প্রথম ১০ দিনে অর্থাৎ ১ থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত পেয়েছে ২৫ হাজার ৪১৯ কিউসেক, ১১ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত পেয়েছে ৩৫ হাজার কিউসেক, ২১ থেকে ৩১ মার্চ– এই ১০ দিনে বাংলাদেশ পেয়েছে ১৫ হাজার ৬০৬ কিউসেক পানি, যা স্মরণকালে সর্বনিম্ন রেকর্ড। বিশেষজ্ঞরা হিসাব করে দেখিয়েছেন, রূপপুরে ৪৫৫ হাজার জিপিএম পানির প্রয়োজন হবে। আর গত ১২ বছরে পদ্মার পানির প্রবাহের গড় হিসাবে প্রতিদিন প্রায় ১৫৫ হাজার জিপিএম পানি নদী থেকে নেয়া যাবে। আর গত বছরের মতো পানির প্রবাহ কমে যাবার ঘটনা ঘটলে পানির সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। এক্ষেত্রে রিজারভয়ার করে পদ্মার পানি ধরে রাখতে চাইলে তা পদ্মার প্রবাহ কমিয়ে দেবে। ইতোমধ্যেই এই প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় সুন্দরবন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে এবং এই প্রবাহ বাড়ানোর ব্যাপারে সরকার ইউনেস্কোর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। আর এই অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ইতোমধ্যেই নেমে গেছে। ফলে সেই পানি ব্যবহারও বিপদ ডেকে আনবে। বলা হচ্ছে কুলিং টাওয়ার করে এই সমস্যার সমাধান করা হবে। কিন্তু কুলিং টাওয়ারের ফিড ওয়াটারে তেজস্ক্রিয় পদার্থ কী পরিমাণ থাকবে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে কী করে, বাতাসের সাথে কুলিং টাওয়ারের পানির মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে কোনো আলোচনা পরিষ্কার নয়। আর কুলিং টাওয়ার বায়ুমণ্ডলে যে তাপ ছাড়বে তা ইতোমধ্যেই দেশের উষ্ণতম অঞ্চলের একটি এই অঞ্চলের তাপমাত্রা আরও বাড়িয়ে মানুষের জীবনে কী প্রভাব ফেলবে সেটা সহজেই অনুমেয়।

৪. আরেকটা বিষয় প্রথম থেকেই আলোচিত হচ্ছে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো পারমাণবিক বর্জ্যের কী হবে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রিপোর্ট এসেছে পারমাণবিক বর্জ্য রাশিয়া নিয়ে যাবে এই মর্মে খবরও এসেছে। কিন্তু খবরটা একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে আসলে বর্জ্য

নয়, রাশিয়া নিয়ে যাবে স্পেন্ট ফুয়েল। স্পেন্ট ফুয়েল আর পারমাণবিক বর্জ্য আলাদা জিনিস। যে কোনো দেশকে (যাদের প্রযুক্তি আছে) টাকা দিলে তারা স্পেন্ট ফুয়েল নিয়ে রিসাইকেল করে বর্জ্য ফেরত দেয়। যেসব দেশ স্পেন্ট ফুয়েল রিসাইকেল করে সাধারণত তারা কেউই বর্জ্য রাখে না। কাজেই এ বিষয়টির আগেই সুরাহা হওয়া দরকার। রূপপুরের পারমাণবিক বর্জ্য রাশিয়ার নিতে হলে তাদের সংসদে আইন সংশোধন করতে হবে। স্পেন্ট ফুয়েল রিসাইকেল করার পর প্রায় ৩ শতাংশ বর্জ্য পাওয়া যায়। পরিমাণে এটা কম হলেও এটা অত্যন্ত উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয় বর্জ্য। এটা সিলিকার সঙ্গে মিশিয়ে গলিত কাচের মতো একটা পদার্থ বানিয়ে তা স্টেইনলেস স্টিলের কনটেইনারে ভরে কংক্রিট দিয়ে শিল্ডিং করে কোনো নির্জন ও শুকনা স্থানে রাখা হয়। এই স্থানটা হতে হয় এমন, যেখানে হয়তো এক লাখ বছরেও পানি আসেনি। এটা সাধারণভাবে করা হয় পরিত্যক্ত লবণখনিতে। এ ধরনের কোনো স্থান বাংলাদেশে নেই। এ ছাড়া একটা হেভি কংক্রিটের স্ট্রাকচার তৈরি করে একটা জনমানবশূন্য নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। সেরকম কোনো পরিষ্কার পরিকল্পনা রূপপুরে নেই, বরং রাশিয়া বর্জ্য নিয়ে যাবে সেটারই প্রচার চলছে।

৫. এরপর আসা যাক দুর্ঘটনার প্রসঙ্গে। জোর দিয়ে বলা হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে না। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, সমস্ত আইএইএ গাইডলাইন অনুসরণ করা হচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু একটা সহজ সত্য হচ্ছে সাধারণভাবে একটা নতুন প্রযুক্তি আসেই একেকটা দুর্ঘটনার পর। নতুন নতুন দুর্ঘটনার পরই কেবল তা থেকে রক্ষার উপায় খোঁজা হয়। কাজেই শতভাগ ঝুঁকিমুক্ত কোনো নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট হতে পারে না। সেক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনা কিভাবে মোকাবেলা করা হবে, এর দায় কে নেবে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনার যে কোনো পর্যায়ে, যে কোনো কারণে পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় প্রকল্পের স্বত্বাধিকারী হিসেবে বাংলাদেশকে নিতে হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নকারী, যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও সরবরাহকারী রাষ্ট্র রাশিয়া দুর্ঘটনার কোনো দায় নেবে না। এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের মূল নির্মাণকাজের জন্য বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে যে সাধারণ চুক্তি (জেনারেল কন্ট্রাক্ট) সই হয়েছে, তার ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে পারমাণবিক দুর্ঘটনার দায়দায়িত্ব নিরূপণের (নিউক্লিয়ার লায়াবিলিটি) বিষয়ে এই বিধান যুক্ত করা হয়েছে। আর এর মাধ্যমে শুধু দায় নয়, দুর্ঘটনার ঝুঁকিও আসলে বেড়েছে। কেননা দায় নিতে না হলে অধিক সতর্ক হবার নয়, বরং অধিক দায়িত্বহীন হবার সম্ভাবনাই বাড়ে। এর সাথে যুক্ত আমাদের নিজস্ব দক্ষ জনবল ও তৃতীয় পক্ষের নজরদারির অভাব, যার ফলে বিপদে বাড়তি মাত্রা যুক্ত হবে। কুদানকুলামে নির্মাণ ঠিকাদাররা চারটি সাব স্ট্যান্ডার্ড পাম্প স্থাপন করেছিল। সেটা ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ড চিহ্নিত করেছিল। সেই পাম্পগুলো সরিয়ে নিয়ে রাশিয়া নতুন পাম্প পুনঃস্থাপন করতে বাধ্য হয়। এ ধরনের বিষয় চিহ্নিত করার মতো দক্ষ লোকজন কি আমাদের আছে? যদি না থাকে তাহলে আমাদের উচিত ছিল একটা 'ইনডিপেনডেন্ট কনসালট্যান্ট' নিয়োগ করা, যারা আমাদের স্বার্থ সুরক্ষা করবে। কিন্তু তা না করে আমরা কনসালট্যান্ট নিয়োগ করেছি এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে, যেটি যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী কোম্পানিরই একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। তারা কার স্বার্থ রক্ষা করবে? আমাদের না চুল্লি সরবরাহকারীর?

পানির যে প্রসঙ্গটি আগে উল্লেখ করেছি সেটা দুর্ঘটনা প্রসঙ্গেও জরুরি। কুলিং টাওয়ার নির্মাণ করে নিয়মিত উৎপাদনের কাজ যদি সম্ভব হয়ও সেটা দিয়ে দুর্ঘটনা মোকাবেলা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বহু বছরের বা যুগের জন্য প্রায় ৩০ লাখ লোক সরিয়ে নিতে হবে। সেটা কি বাংলাদেশে আদৌ সম্ভব?

৬. নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের পক্ষে একে দূষণমুক্ত, নিরাপদ, সস্তা ইত্যাদি বলে যে প্রচার চালানো হয় সেগুলোও আসলে সত্য নয়। দুর্ঘটনা ও তেজস্ক্রিয়তা দূষণের কথা বাদ দিলেও আরও নানা মাত্রার দূষণ এখানে ঘটে। একটা পাওয়ার প্লান্ট যে পরিমাণ তাপ উৎপাদন করে তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সে পরিবেশে ছড়িয়ে দেয়। নিউক্লিয়ার প্লান্ট থেকে নির্গত পানি জলাশয়, নদী বা সাগরে পড়ে পানির দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমায়, তাপমাত্রা বাড়ায়, যা জলজ প্রাণের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। পানিতে তেজস্ক্রিয় উপাদান যোগ করে বিষাক্ত রাসায়নিকের পরিমাণ বাড়ায়। প্রতিটি নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টরই কার্বন-১৪ আইসোটোপ নির্গমন করে; কাজেই এর কার্বনমুক্ত হবার দাবিও সঠিক নয়।

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৩০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ ধরে নিরাপত্তা অঞ্চল ধরলে তার ভেতরে পাবনা জেলার বেশিরভাগ অঞ্চল, কুষ্টিয়া জেলার একাংশ, নাটোর জেলার একাংশ এর ভেতরে পড়ে, যার জনসংখ্যা ৪০ লাখের বেশি। ৫ কিলোমিটারের মধ্যেই পড়ে ঈশ্বরদী শহর। এমনকি রূপপুরের একেবারে লাগোয়া লালন শাহ সেতু, ইপিজেড, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, পদ্মা নদী, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিধন্য বিবিসি বাজার।

৭. সব শেষে আসা যাক অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে। প্রযুক্তি উন্নয়নের সাথে পাল্লা দিয়ে অন্যান্য বিদ্যুৎ উৎপাদনী মাধ্যমে খরচ কমছে আর পারমাণবিক বিদ্যুতের ক্ষেত্রে তা কেবলই বাড়ছে। তাইতো 'ফিক্সড কস্ট' মডেলের পরিবর্তে রাশিয়ার সাথে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ চুক্তি হয়েছে 'কস্ট প্লাস' মডেলে। এর ফলে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান খরচের অঙ্ক দফায় দফায় বাড়িয়ে নিতে পারবে। ঠিক একই প্রক্রিয়ায় কাজ শুরুর আগেই রূপপুর প্রকল্পের কাজে প্রাক্কলিত ব্যয় ১ লাখ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১ লাখ ১৮ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। আবার রূপপুরে ভারী যন্ত্রপাতি পরিবহনে নৌপথ তৈরিতে ড্রেজিংয়ের জন্য অনুমোদন পেয়েছে ৯৫৬ কোটি টাকার প্রকল্প। বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন, নির্মাণ খরচ, জ্বালানির খরচ, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি খরচ যোগ করলে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম পড়বে ৭.৫০ থেকে ৮ টাকা। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের ঋণের পরিমাণ ১৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যা বর্তমান হারে বৃদ্ধি পেলে পাঁচ বছর পর ৩০ বিলিয়ন ইউএস ডলারে দাঁড়াবে। রাশিয়ার ঋণ যুক্ত হলে এই ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪২ বিলিয়ন ইউএস ডলারে। এমতাবস্থায় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বলার মোটেই উপায় নেই, সাথে আছে বিশাল অঙ্কের ঋণের বোঝা। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদনক্ষমতা শেষ হয়ে যাবার পর তাকে ডিকমিশনিং করতে হয়, তারও খরচ আছে। রূপপুর প্রকল্পে এই ব্যয় ধরা হয়নি। যখন জনগণের কাছে বিদ্যুৎ বিক্রি করা হবে, তখন এই ব্যয় বর্তমানে ধরা ব্যয়ের সাথে যুক্ত হলে আসলে বিদ্যুতের দাম কত দাঁড়াবে?